ঝড়ের আবহে

সুচন্দন রায়

পরাণ ডাক্তার নিজের দোকান - কাম - চেম্বারের সামনে ফালি জায়গাটায় খালি বেঞ্চের উপর ঠায় বসে। মুখ আকাশে। জৈষ্ঠ্যের ভ্যাপসা গরমটা তার ব্যারেলের মতো শরীরের সমস্তটা জুড়ে লেপটে আছে। বৃষ্টির দেখাটি নেই। কালবৈশাখী কি ভি আর এস নিয়ে নিল!

এতটা বেলা পর্যন্ত একটিও পেশেন্টের দেখা নেই। রোদের চোটে মানুষের অসুখ - বিসুখ সব শুকিয়ে বেপাত্তা। পরাণ ডাক্তার প্রার্থনার ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তাকায় — তৃষ্ণার জলের আকাঙ্ক্ষায় নয়, পেটের খোরাকের ধান্দায়। এভাবে টানা রোদ্দুর আর অনাবৃষ্টি চলতে থাকলে তার পেটও শুকনো, দোকানের নাক বরাবর চিতিয়ে থাকা 'পড়া' জমিটার মতো খটখটে। রোগজীবাণুগুলো এই কাঠফাটা গরমে এখানে ওখানে ইতি উতি ঘাপটি মেরে আছে। শুকনো মাটিতে জলে পড়লে মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা ঘাসে বীজ থেকে শুধু সবুজ ঘাসই গজাবে না, রোগের বীজ থেকে নানান রোগও জন্ম নেবে। তেড়েফুঁড়ে উঠবে রোগজীবাণুরা —নানান ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়া। ডাইরিয়া, সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা। পরাণ ডাক্তারের চেম্বারের সামনে ভিড় উপচে পড়বে। কলের পর কল সামলাতে হিমসিম খাবে পরাণ ডাক্তার।

সকাল থেকে আকাশে ঝড়ের উপক্রমণিকা। ছেঁড়া এক খণ্ড মেঘ উড়ে এসে ছায়া ফেলে পরাণ ডাক্তারের মাথায়। হঠাৎ বুক পকেটে গান বেজে ওঠে — 'দিল চাহতা হ্যায়'...

মোবাইলের আলো, যে নিদাঘের বৃষ্টিবিন্দু!

পকেট থেকে আদ্যিমার্কা মোবাইল সেটটা হাতে নিয়ে পরাণ ডাক্তার দ্যাখে লক্ষণ সরকার। 'শক্তিমান' ইটের মালিক।

তবু বাটন টিপে তাড়াতাড়ি মোবাইল কানেক্ট করে — হ্যাঁ, বলুন স্যার ... ।

— আমি ভাঁটা থেকে বলছি। এখানে একজনকে টেটভ্যাক দিতে হবে।

ডাক্তারের উৎসাহে ভাটা পড়ে। ফ্যাকাসে গলায় বলে — ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিন।

— পাঠানো যাবে না। এখানে এসে দিয়ে যেতে হবে। তোমার কি অসুবিধা আছে? তাহলে অন্য কাউকে না হয় ...

লক্ষণ সরকারের কথা শেষ হয় না। তার আগেই সাত তাড়াতাড়ি পরাণ ডাক্তার বলে

— না না, ঠিক আছে। বিকালের দিকে গেলে অসুবিধা নেই তো?

লক্ষণ সরকারের পাকা মাথা হিসাব লাগাতে শুরু করে। তাড়াহুড়ো করে এখনই আসতে বললে ইমার্জেন্সি চার্জ নিয়ে বসবে। তাই কেস যত সিরিয়াসই হোক, লক্ষণ সরকার বলে

—যখন হোক একবার এলেই হবে।

মোবাইল বন্ধ হয় ওপার থেকে। পরাণ ডাক্তার ভাবে, একে তো এই খরার বাজার। তার উপরে একটি টেটভ্যাক দেবার জন্যে তেল পুড়িয়ে এতটা রাস্তা ডেঙিয়ে যাওয়া! পুরো ভরতুকির কেস।

কিন্তু ভরতুকি দিয়ে হলেও এই কেসগুলোকে হাতছাড়া করা যায় না। লক্ষণ সরকার শুধু পয়সাওয়ালা লোকই নয়, পার্টির একজন হোমরাচোমরা। পার্টি আর পয়সা এখানে হাত ধরাধরি করে চলে। ভাঁটার নামার আগে লক্ষণ সরকারের ধান এবং সারের কারবার চলত। তাতে লোকবল বা পার্টিবল বিশেষ দরকার হত না। আড়তের গদিতে বসেই দু-কাট মারত। চাষিরা চাষের সময় ধারে সার কিনতে বাধ্য হত দেড়া দামে। ফসল উঠলে চাষির খামার থেকে সেই ফসল প্রায় অর্ধেক দামে কিনে নিত লক্ষণ সরকার। ওই ব্যবসা ছেড়ে আরও বেশি লাভের আশায় ইটভাঁটার ব্যবসা শুরু করে। পার্টির দৌলতে মালদা, পুরুলিয়া এমনকী বিহার - ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মানুষগুলোকে সে হাফ - ম্যান হাফ - অ্যানিম্যাল বানিয়ে রাখে। লক্ষণ সরকারের দাবড়ানির চোটে কারও ট্যাঁ - ফোঁ - টি করবার জো নেই।

পরাণ ডাক্তারের মতো চুনোপুঁটির এত ঘাড়ের বক্ত হয়নি এ এরকম একজন লক্ষণ সরকারের কথা অমান্য করে। যে কোনো মূল্যে ওদের খুশি রাখার চেষ্টা করতে হয়। তা না হলে যখন তখন কোপ এসে পড়বে। এলাকা থেকে উচ্ছেদ করে ছাড়বে। তাছাড়া পরাণ ডাক্তার এই মানুষগুলোকে একটু বেশি বেশি সমঝে চলে। কারণ সে তো এখানে ছিন্নমূল। যাকে বলে উড়ে এসে জুড়ে বসা। এলাকার পাঁচজনের সহযোগিতায় এখন খানিকটা থিতু হয়েছে পরাণ দাস। সুদূর রামপুরহাট থেকে ইয়ার - বন্ধু দেবাশিসের হাত - চিঠিটি হাতে করে একদিন সে একরকম উড়েই এসেছিল এখানে। এক ঝড়ের রাতশেষে। ঝড়ই যে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় — এখান থেকে ওখান, ওখান থেকে সেখান।

শোকেসের উপর থেকে জলের বোতলটা টেনে নিয়ে গলায় খানিকটা হড় হড় করে ঢেলে নেয় পরাণ ডাক্তার। উত্তর দিকের বেলগাছটায় একা বসে একটা কোকিল। আচমকা ওটাকে দেখে কাক মনে হয়েছিল। এখন চিনতে পেরে নিজের বোকামিতে নিজেই ফক করে হেসে ফেলে — কাক আর কোকিলের তফাতটাও কি সে আজকাল ভুলতে বসেছে!

সকাল থেকে খদ্দেরের দেখাটি নেই। এক বৃদ্ধ খুক খুক করে কাশতে কাশতে দোকানমুখে এগিয়ে আসে। পরাণ ডাক্তার ভাবে, গেঁটেবাত কিংবা কাশি অথবা হাঁপানি যাই হোক, বউনিটা তো হবে।

বৃদ্ধ বিড়ি টানতে টানতে বিড়ির দোকানে ঢুকে যায়। অগত্যা গাছের ডালে একা বসে থাকা কোকিলটাকেই খুঁটিয়ে দ্যাখে পরাণ ডাক্তার। পরাণ ডাক্তারের স্থূল শরীরে সূক্ষ্ম চিন্তা ভর করে। পাখিটাকে দেখে মনে হয় ওটা যেন তার মতো স্বজন ছাড়া, প্রিয়জন হারা — তারই মতো শেকড়হীন। পাখিটাও কি প্রতারিত? কৃষ্ণাকে প্রতারক ভাবতে মন সায় দেয় না আজও। কিন্তু কৃষ্ণা এটা কী করে পারল? ওর সঙ্গে সম্পর্কটা তখন তো প্রায় পরিণতির মুখে। ওর বাবাও চেয়েছিল নিখরচায় মেয়েটার একটা গতি হয় তো হয়ে যাক। নিজে চিরকালের ভূমিহীন। সেখানে পরাণের বাপের বিঘে তিনেক ধানজমি সহ এককাচি দো - জমিও আছে। ওতেই মেয়ের দু - বেলা দু - মুঠো দিব্যি জুটে যাবে। কিন্তু কৃষ্ণার শরীরে তখন আরও কারও আনাগোনা।

হাতে আঁটা মোটা বেল্টের হাতঘড়িটার দিকে তাকায় পরাণ ডাক্তার। একপ্রস্থ আড়মোড়া ভেঙে নিয়ে সোজা উঠে পড়ে। কানে তালা লাগানো ঘরঘর শব্দে শাটার নামিয়ে দেয়। মুখে বিড়বিড় শব্দ বেরিয়ে আসে — এরকম চলতে থাকলে পেটটা কোথাও বন্ধক রাখতে না হলে হয়।

মুখ ফিরিয়ে দ্যাখে পিছনে একজোড়া স্বামী - স্ত্রী। কোলে বছর দুয়েকের শিশু। যাক, বউনিটা হল।

দ্রুতহাতে শাটার তুলে পরাণ ডাক্তার বলে — খুব টাইমে এসে পড়েছেন। এক্ষুনি একটা ইমার্জেন্সি কলে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম।

যখনই কোনো রোগী আসে তখনই পরাণ ডাক্তারের 'ইমার্জেন্সি কল' থাকে।

বাচ্চাটির মায়ের চোখে ডাক্তারকে শেষ মুহূর্থে পেয়ে যাবার খুশি। তৃপ্ত চোখে ডাক্তারকে বলে — সকাল থেকে ছেলেটার গা - টা কেমন ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে ডাক্তারবাবু।

থার্মোমিটার লাগিয়ে জ্বর পরীক্ষা করে ডাক্তার — কই, টেম্পারেচার তো তেমন নেই?

—রাত্রের থেকে কাশিটা হচ্ছে খুব।

ছেলের বাবার হাতে এক ফাইল সারভিল জুনিয়র দিয়ে পরাণ ডাক্তার বলে — হাফ চামচ করে দিনে তিনবার খাওয়ান। কমে যাবে।

— ডাক্তারবাবু, সকাল থেকে ও যে কিছুই খাচ্ছে না। উদ্‌বেগ ফুটে ওঠে মায়ের প্রশ্নে। পরাণ ডাক্তার জিজ্ঞেস করে — কিছুই খায়নি সকাল থেকে?

— সেই সকালবেলা একটু হরলিকস আর একবার দুধ - সাবু খেয়েছে খালি।

পরাণ ডাক্তার মনে মনে ভাবে, সবে সাড়ে দশটা বাজে, এর মধ্যে ওইটুকু বাচ্চা আর কী খাবে, বাটি ভর্তি মুড়ি আর থালা ভর্তি ভাত? সোনা - দানা খাওয়াতে পারলে বোধহয় আরও খুশি হয়।

মনে যাই হোক, মুখে ওসব কথা বলা যায় না। খদ্দের চটালে তো আর চলবে না। দু-দফায় আরও দু-রকমের ওষুধ বের করে ডাক্তার। যত্ন সহকারে খাবার নিয়মকানুন বুঝিয়ে দেয়।

ওদের চলে যাবার পথে অপলক তাকিয়ে থাকে পরাণ ডাক্তার। সে নিজে যখন ওইটুকু ছিল তখন তার বাবা-মাও তো তাকে নিয়ে এরকমই উদ্‌বিগ্ন হত। ওই শিশুটিকে ঘিরেই বাবা মায়ের পৃথিবী, হৃৎপিণ্ডের রক্ত চলাচল, ফুসফুসের ওঠানামা। ওকে নিয়েই ওদের সুখদুঃখ, আনন্দ - উদ্‌বেগ, নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়া। একই খাতে বয়ে চলা।

পরাণ ডাক্তারের জীবনের গতিপথও এখন বাঁধা গতের । সেখানে আনন্দ দেবার কেউ নেই, নতুন করে দুঃখ দিতেও কেউ আসে না। পরাণ ডাক্তার মনে মনে বলে, এই বেশ ভালো আছি। জীবনটা একটা অভিশাপ না আশীর্বাদ, নতুন করে সে ভাবনা তাকে আর ভাবায় না। সংসার পাতার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে কবেই। ঝড়ের স্মৃতি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। বিয়ের কথা মনে হলে কৃষ্ণার মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কৃষ্ণাকে তো সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। তবু কৃষ্ণা কেন যে আর একজনের সঙ্গে...।

বিষয়টা পোয়াল-চাপা রাখার চেষ্টা করেছিল কৃষ্ণা। কিন্তু সৃষ্টি তো থেমে থাকে না। জীবন চাপা থাকে না। মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। সৃষ্টির যে আদিম এবং চিরাচরিত প্রক্রিয়ায় কৃষ্ণা মেতেছিল, হোক সে বৈধ কিংবা অবৈধ, তাতে অনিবার্যভাবে শরীরে জন্ম নেয় একটি জীবন। শরীর ফুঁড়ে মাথা তুলে জানান দেয় তার অস্তিত্ব। কৃষ্ণার বাবা পরাণকেই দায়ী করে। গাঁয়ের পাঁচজনকে পাশে নিয়ে কৃষ্ণাকে বিয়ে করার জন্য চাপ দেয়। আকাশ থেকে পড়ে পরাণ। একে তো চোখের সামনে স্বপ্ন ভেঙে খান খান। কৃষ্ণার চরম বিশ্বাসহীনতা। তার উপরে এই উলটো চাপ। নিরুপায় পরাণ রাতারাতি ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

বেলা চড়েছে অনেকখানি। মেঘলা রোদের ঝাঁজ একটু বেশি। এরপর পরাণ ডাক্তার চরতে বের হবে। বুড়ো এম এইট্টি-টা একপাশে এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে। সেকেন্ড - হ্যান্ড, থার্ড - হ্যান্ড যাই হোক, গাড়ি একটা চাই। তা নাহলে ডাক্তার বলে কি ঠিক ঠিক মানায়? বিশেষ করে কলে গেলে?

কঙ্কালসার গাড়িটাকে টেনে সোজা করে পরাণ ডাক্তার। মড়মড় ধ্বনি ওঠে বৃদ্ধের শরীরে। পরাণ ডাক্তার দু - মণি শরীরটা নিয়ে চড়ে বসে। বিকলাঙ্গ গাড়িটার পিঠে সওয়ারি হয়ে সে যাবে ডাক্তারি ফেরি করতে। সুইচ অন করে স্টার্ট দেয় গাড়িতে। কিকের পর কিক। কার্বোরেটরে প্লাগ টেনে বের করে জমে থাকা কার্বন পরিষ্কার করে। টুল বক্স থেকে শিরিষ কাগজ বের করে একপ্রস্থ ঘষে নেয়। তারপর প্লাগ গুঁজে কিক করতেই স্টার্ট। সঙ্গে গলগলে ধোঁয়া। প্রথমটায় কানিকটা গজগজ করে তারপর তীব্র গর্জন করতে করতে এগিয়ে যায় দ্বিচক্রযান।

বাড়ি বাড়ি ঘুরে কারও প্রেশার মেপে, প্রেশারের বড়ি দিয়ে, কাউকে সরবিট্রেট, কারও বা গার্ডিনাল থার্টি ফুরিয়েছে কি না খবর নিয়ে কিংবা ডেরিফাইলিন, টেটভ্যাক পুশ করে প্রতিদিন দু-দশটাকা রোজগারের ব্যবস্থা একরকম হয়। সব কেস থেকেই যে পয়সা আসে এমন নয়। এর মধ্যে আবার অনুদান, সমাজসেবা, গরিব উদ্ধার এসবও আছে। কারও বাড়িতে এক কাপ চা, এক গ্লাস সরবত কিংবা হাতপানিটাও হয়ে যায় মাঝে মাঝে। প্রতিদিনের এই প্রাত্যাহিক পরিভ্রমণে দুটো - একটা উপরি খদ্দেরও জুটে যায় কপাল জোরে।

ভরদুপুরে সূর্যকে মাথায় করে ডেরায় ফেরে পরাণ ডাক্তার। ডেরা বলতে দোকানের উলটো পিঠ। সেখানে ভাতে - ভাত দুটো ফুটিয়ে নিয়ে স্নান সেরে খাওয়া - দাওয়া। তারপর ভোঁত ভোঁত করে নাক ডেকে টানা একাট ঘুম।

মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ে পরাণ ডাক্তার। কিন্তু আজ আর চোখ বন্ধ করেও ঘুম আসতে চায় না। মাঝে মাঝে এরকম হয় পরাণের। কৃষ্ণাকে যেদিন বেশি বেশি মনে পড়ে, সেদিন। গভীর এক জাড্যতায় পেয়ে বসে, সেদিন না ঘুম, না খিদে, না কোনো কাজ । পরাণ ডাক্তারের চোখ এবং সিলিং -এ, মন পিছন হেঁটে সাত বছর আগে। সেদিন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসার মুহূর্তেও কৃষ্ণার মুখটা মনে পড়েছিল বারবার। কৃষ্ণার অবস্থার কথা ভেবে ওর প্রতি করুণা হয়েছিল। ওর পরিণতির কথা চিন্তা করে একটা ভয়ও বাসা বেঁধেছিল মনে।

কৃষ্ণাকে তারপর এক আত্মীয়ের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে সোজা বিহারে। এখন সে কোথায় আছে, কেমন আছে কে জানে? এ জীবনে তার সঙ্গে দেখা হওয়া কি আর সম্ভব! পরাণ নিজেই তো এখন রামপুরহাট থেকে বর্ধমান পেরিয়ে বাঁকুড়ার এই নতুনগ্রামে। দেবাশিস সেই রাতে একটা হাতচিঠি লিখে তাকে এখানে পাঠিয়ে না দিলে কী যে হত! সেদিন বন্ধুর কাজই করেছিল

দেবাশিস। নতুনগ্রামে দেবাশিসের পিসতুতো দাদার ওষুধের দোকান। প্রথম - প্রথম সেই দোকানে ফাই - ফরমাস খাটত পরাণ। পরে ওষুধ বিক্রি কাজেও হাত লাগিয়েছিল। সেখান থেকেই সে শিখে নিয়েছিল কোন রোগের কী ওষুধ, কতখানি ডোজ। ইঞ্জেকশন পুশ করতেও সে হাত পাকিয়েছে ওখানেই। আর এখন তো পরাণ ডাক্তার নিজের চেম্বারে বসে প্রয়োজনে ছুরিও চালায়। মনের সাহসটাই তাকে এ লাইনে খানিকটা জায়গা করে নিতে সাহায্য করেছে। এম বিব বি এস (অলটারনেটিভ মেডিসিন) সার্টিফিকেটও একটা বাঁধিয়ে রেখেছে দোকানের গণেশজির মূর্তিটার পাশে।

বিকালে দোকানের শাটার ডঠতে আজ একটু দেরি হয়। ভাঁটায় যাবার কথাটা পরাণ যে ভুলে গেছে এমন নয়। ইচ্ছা করেই দেরি করছে — একটু হাঁকপাকানি ধরুক। কিন্তু একটা ব্যাপার ভেবে অবাক হচ্ছে পরাণ ডাক্তার। একটা টেটভ্যাক দেবার জন্যে লক্ষণ সরকার নিজে ফোনটা করল কেন? কেস কি কিছু সিরিয়াস? এমনিতে তো সর্দারজি খবর দেয়। লেবারদের চিকিৎসা করানোর ভার সর্দারজি নিজের হাতে রাখে, ওদের উপর আধিপত্য কায়েম রাখতে। বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে লেবারদের জড়ো করে সে-ই তো ভাঁটায় নিয়ে আসে। লেবারদের রোজগার থেকে কমিশন পায়, আরাম কেনে। লেবারদের চিকিৎসার খরচ অবশ্য ওদের বেতন থেকে কেটে নেওয়া হয়। দু-বেলা পেটপুরে খেতে পাওয়া না - পাওয়া ওই মানুষগুলোর ওষুধ খাবার নেশা দেখে অবাক হয় পরাণ ডাক্তার। অদ্ভুত ওদের জীবনবোধ। ওরা বলে, 'বাড়িহাঁ সে দাবায় দাও ডাক্তারবাবু, এ জিন্দিগি য্যায়সে জলদি খতম হয়ে না যায়। পাপের প্রায়শ্চিত ইস জিন্দিগি মে পুরা কর লেঙ্গে, আগলা জন্ম মে য্যায়সে ভাট্টি কা লেবার বনকে পয়াদা হতে না হয়।'

অসুখ - বিসুখ পরাণ ডাক্তার বারবার ওদের ওষুদ দেয়। ওদের ক্ষেত্রে অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে সে। কম দামি ওষুদেই দিব্যি ওদের রোগ সেরে যায়। সেখানে একটু দামি ওষুধ না দিলে বড়োলোকদের কোনো রোগ থামতে চায় না। বেশি দামি ওষুধ না হলে ওদের মনই ভরে না।

আর দেরি করে না পরাণ ডাক্তার। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ে। গাছপালা সব নিঝুম হয়ে আছে। প্রকৃতি যেন ভিতরে ভিতরে কালবৈশাখীর আয়োজনে ব্যস্ত। পরাণ ডাক্তার আশার আলো দ্যাখে। মনে মনে বলে, দারুণ একটা ঝড় উঠুক — গাছপালা সব তোলপাড় করে দিক। আকাশ ফুটো করে ঝরঝধরিয়ে বৃষ্টি নামুক, ডুবিয়ে দিক এই চরাচর। তবে ভাঁটা থেকে সে ডেরায় ফিরে আসার পর। বোঁ করে একছুটে ভাঁটায় গিয়ে সে টেটভ্যাকটি পুশ করবে কি আসবে। আকাশটা ততক্ষণ নিশ্চয় ধৈর্য ধরবে।

লাল মোরাম রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটিয়ে দেয় পরাণ ডাক্তার। পিছন পিছন ধাওয়া করে লাল ধুলো। মোরাম রাস্তাটা ছেড়ে এবার ডানদিকে মোড় নেয় পরাণ ডাক্তার। গাড়ি এখন দামোদরের গা ঘেঁষে হাঁটি - হাঁটি পা - পা। সামনের ঝোপঝাড়টা ডিঙিয়ে যেতেই দূর থেকে পরাণ ডাক্তারের নজরে পড়ে ভাঁটার চিমনি। পরাণ ডাক্তার যখন নতুন এসেছিল তখন জায়গাটা ছিল সবুজে সবুজ। ছবিটা এক ঝলক ভেসে ওঠে চোখের সামনে। এখন ইট আর ইটের ধুলোয় লাল। কোথাও কোথাও কালো - কয়লার গুঁড়ো আর চিমনির ধোঁয়ায়। দামোদরের বিনা পয়সার বালি আর এত সুন্দর জায়গা দেখে লক্ষণ সরকার জমিগুলো লিজ নিয়ে নেয়।

বাঁদিকে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ভাঁটায় ঢুকে পড়ে পরাণ ডাক্তার। বাঁ হাতেই সর্দারজির আস্তানা। আস্তানায় সর্দারজির আরাম - বিরামের ব্যবস্থা পাকা — গরমে ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডায় গরম। একটা তক্তপোশের উপর বসেছিল সর্দারজি — ডাক্তারের অপেক্ষায়। পরাণ ডাক্তারকে দেখে ধড়মড় করে উছে আসে।

—আসেন ডাক্তারবাবু। আপনে বহুত দেরি করিয়ে দিলেন।

পরাণ ডাক্তার বলে, 'চলুন, পেশেন্ট কোথায়?'

—ডেরা মে আছে।

দ্রুত পায়ে সর্দারজি এগিয়ে চলে। পিছনে পরাণ ডাক্তার। দু - পাশে দু - চোখ খোলা। কোথাও ভাঙা ইটের স্তূপ। কোথাও কাঁচা ইটের পালুই যত্ন করে ঢাকা। এক জায়গায় ভূতের মতো কতগুলো মেয়েমানুষ কয়লা ভাঙায় মনোযোগী। শাড়ি, জামাকাপড় চোখ - কান - নাক কিছুই আলাদা করে চেনা যায় না। সবই কালো। চিমনির অদূরে পরিত্যক্ত কাঁচা ইটের পাহাড়।

বাঁদিকের ছবিটার দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে পরাণ ডাক্তার। ভাঙা ইট পর পর সাজিয়ে ছোটো ছোট খুপরি — শ্রমিকদের বাসস্থান। শুয়োর কিংবা ছাগল - গোলায়ের মতো। গোরুর পক্ষেও অনুপযুক্ত। এগুলোতে মানুষ বাস করে কী করে! আঁতকে ওঠে পরাণ ডাক্তার। যে কোনো মুহূর্তে হুড়মুড়িয়ে পড়তে পারে খোলা ইট। ইটের ফাঁকফোকরে নানান কীটপতঙ্গ, সাপ - খোপ - দুধের বাচ্চাগুলোর খেলার সঙ্গী।

কতগুলো খুপরি পরপর খালি দেখে পরাণ ডাক্তার সর্দারজিকে কারণ জিজ্ঞেস করে। সর্দারজি বলে, 'সামনে বরসাত আসছে কি না? অফ সিজন। সে জন্য ওদের ছুট্টি করিয়ে দেশে ভেজে দিয়েছি। দেশে গিয়ে সব আপনা আপনা কাম ধান্দা করবে।'

পরাণ ডাক্তার হিসাব মেলাতে হোঁচট খায়। যে মানুষগুলো তাদের কাজের আটমাস সপরিবারে নরকবাস করে, তাদের কর্মহীন চারটে মাস কোথায় কীভাবে কাটে?

সর্দারজিকে অনুসরণ করে একটি খুপরির সামনে হাজির হয় পরাণ ডাক্তার। খুপরির ভিতরে চোখ ঢোকাতে পরাণ ডাক্তারের মতো বেঁটে মানুষকেও হেঁট হতে হয়। পরাণ ডাক্তার দ্যাখে ভিতরে একজন শুয়ে — সম্ভবত স্ত্রীলোক। খোলা পা দুটো শুধু দরজা দিয়ে দেখা যায়। দরজা বলে ভুল হবে — তিন ফুট লম্বা ফুট খানেক চওড়ার একটা ফাঁক বা ফাটল।

সর্দারজি পরাণ ডাক্তারকে একটা উঁচু বেদির উপর বসতে বলে। পাশাপাশি খুপরিগুলো থেকে দু - চারজন মেয়েপুরুষ একপাল শিশু বেরিয়ে এসে ভিড় করেছে। রোগীকে দেখতে খুপরির ভিতরে কষ্ট করেও ডাক্তারের ঢোকার উপায় নেই। দুজন ধরাধরি করে রোগীকে বাইরে নিয়ে আসে। নিম্নাংশ রক্তে ভেজা। কাপড়চোপড় জ্যাবজেবে। ঘরের মেঝেতেও জমা হয়ে আছে চাপ চাপ রক্ত। পাশে ছেঁড়া কাঁথাকানির মধ্যে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে সদ্যোজাত শিশু।

পরাণ ডাক্তার জানতে চায় — মহিলার স্বামী কোথায়?

সর্দারজি উত্তর দেয় — ট্রাক্টর লিয়ে দল কা সাথ মাটিতে গেছে।

— কতক্ষণ আগে ডেলিভারি হয়েছে?

—ডেলিভারি কা বাদ খুন বন্ধ হচ্ছিল না। তখনই তো বাবু আপকো ফোন কোরলেন।

— নাড়ি কাটল কে?

আপাদমস্তক ঘোলাটে শাড়িতে মোড়া এক বয়স্ক স্ত্রীলোক সোৎসাহে উত্তর দিতে এগিয়ে আসে — ইখানকার যত লেড়কা লেড়কি পায়দা হোয়, সবহি তো হামারই হাত সে ডাক্তারবাবু।

— ব্লেডটা কি নতুন ছিল, নাকি মরচে ধরা ভোঁতা?

বৃদ্ধার চোখমুখ দেখার উপায় নেই। গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে বিস্ময় আর দৃঢ় বিশ্বাস

বিলেডের কী জরুরত আছে বাবু! বাঁশের ছিলকা সে তো আরাম্‌সে কাম চোলে।

কেস রীতিমতো সিরিয়াস। পরাণ ডাক্তারের কপালে চিন্তার ভাঁজ। লক্ষণ সরকার এরই জন্যে শুধু একটি টেটভ্যাক - এর ফরমায়েস করেছিল! এখনও পর্যন্ত যে রক্ত বন্ধ হয়নি, তার কী হবে?

লক্ষন সরকার ততক্ষণে সশরীরে হাজির। বলে — ডাক্তার, টেটভ্যাক একটা পুশ করে দাও। ভেবে মাথা ফাটানোর কিছু নেই।

ফরমাসে মতো টেটভ্যাক ইঞ্জেকশন পুশ করে ডাক্তার। কিন্তু ইমিডিয়েট ব্লাড বন্ধ করতে না পারলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে যে পেশেন্ট মারা পড়বে!

পরাণ ডাক্তার ক্ষরিত রক্তের হিসাব কষে । মুখ দেখে পেশেন্টের শারীরিক অবস্থা অনুমান করার উপায় নেই। মুখ কাপড়ের পুঁটুলির মধো গোঁজা।

বাইরের বাতাস পেয়ে পেশেন্টের নড়াচড়া করার ক্ষমতাটুকু ফিরে আসে। পরাণ ডাক্তারের চঞ্চল চোখ এদিক এদিক তাকায়। লক্ষণ সরকার এবং সর্দারজির যুগপৎ দৃষ্টি ডাক্তারের মুখে। কী করবে ভেবে স্থির করতে পারে না ডাক্তার। রক্ত বন্ধ করার জন্যে মিথারজিন না হোক, নিদেনপক্ষে একটা ক্রোমোস্ট্যাটও এক্ষুনি পুশ করা দরকার। কিন্তু লক্ষণ সরকারের বিনা অনুমতিতে কিছুই করা যায় না। দামটা না হয় ছেড়ে দেবে, কিন্তু ইঞ্জেকশন দেবার দায়িত্বটা সে নিজে থেকে নেয় কী করে?

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে পরাণ ডাক্তার। ইঞ্জেকশনের নিডল সেট করে নেয় দ্রুত হাতে। ক্রোমোস্ট্যাটের শিশিটা হাতে নিয়েও সরিয়ে রাখে। মিথারজিনের অ্যাম্পুলে সুচ ফুটিয়ে সিরিঞ্জের মধ্যে ওষুধ টেনে ভর্তি করে নেয়। তারপর পেশেন্টের বাঁ হাতটা সযত্নে নিজের জানুর উপর রেখে দীরে ধীরে পুশ করে দেয়। সুচ ফোটানোর যন্ত্রণায় উঃ শব্দে মুখ তোলে পেশেন্ট। ইঞ্জেকশন - এর সিরিঞ্জসহ ডান হাতটা কেঁপে ওঠে পরাণ ডাক্তারের।

ব্যাগ গুছিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ে ডাক্তার। স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে যাবার মূহূর্তে লক্ষণ সরকার হাঁক পাড়ে — তোমার টেটভ্যাক্সের দামটা নিয়ে যাও ডাক্তার।

গুড়ুম করে মেঘ ডাকার শব্দ হয়। শুরু হয় প্রচণ্ড ঝড়। সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে শুধু রোগজীবাণুদের বাড় - বাড়ন্ত হল না, মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা ঘাসের বীজ থেকে নতুন ঘাসও গজাল — সবুজ ঘাস।

ভুরভুর করে মাংসের ঝোলের গন্ধ উড়ছে পড়াণ ডাক্তারের ডেরা থেকে। চেম্বারের ভিড় মিটতে রাত একটু বেশি হয়েছিল। স্টোভে মাংসটাকে কষে জল ঢালতেই সর্দারজি। সঙ্গে দু-তিনজন। ডাইরিয়া। সেলাইন চালু করা হয়েছে। সেলাইনের বোতলের গায়ে দুটো - একটা ইঞ্জেকশন পুশ করে দিচ্ছে ডাক্তার। একটা সেলাইনের বোতল শেষ হলে আবার একটা। ঘন ঘন নাড়ি দেখছে ডান হাতের কবজি ধরে।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে চোখ খোলে সর্দারজির। দুর্বল স্বরে বলে — আপনে খুব বাঁচিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু।

স্বস্তির শ্বাস ফেলে পরাণ ডাক্তার। তারপর জিজ্ঞেস করে — সিদিন যাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে এলাম সে এখন কেমন আছে?

— সেরে গেছে। কই মাছের প্রাণ তো! দেশে চলে গেছে ওরা।

আকাশে মুখ তোলে পরাণ ডাক্তার। কার যে কখন কোনটা দেশ! কৃষ্ণা আবার কোন দেশে কে জানে। নৈর্ঋত কোণে কীসের যেন একটা তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

ভাবনার বৃত্তচাপ থেকে বেরিয়ে সামনে তাকায় পরাণ ডাক্তার। আবার একজন রোগী। ইনফ্লুয়েঞ্জা। পিছনে আরও একজন। তার পিছনে আর...। পৃথিবী জোড়া শুধু যেন রোগী। পরাণ ডাক্তারের চেম্বারের সামনে থিকথিক করছে ভিড়। তাদের মধ্যে লক্ষণ সরকারও একজন। কাছাকাছি আর ভালো ডাক্তার নেই কোনো। সবাইকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় পরাণ ডাক্তার একা।